

# ବୋଧୋଦୟ

୧୮୮୨ ଶ୍ରୀଷ୍ଠାନ୍ଦେ ମୁଦ୍ରିତ ପଦ୍ମାଧିକ୍ଷତତମ ସଂସ୍କରଣ ହୁଏତେ ।



## বিজ্ঞাপন

বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল ; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে । যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা । অল্পবয়স্ক স্কুলমাত্রের বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সর্বিশেষ যত্ন করিয়াছি ; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না । মধ্যো মধ্যো, অগত্যা, যে যে অপ্রচলিত ছন্দে শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে, সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল । এক্ষণে, বোধোদয় সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা ।

২০এ চৈত্র । সংবৎ ১৯০৭ ।

## একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী রূপা গ্রামে যে রৌড়িং ক্লব অর্থাৎ পাঠাগার আছে, উহার কার্য্যদক্ষী শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া, পুত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন । তৎপরে, কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তর মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন । ইহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত ও সর্বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি । তাহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে । তাহারা এরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শন না করিলে, ঐ সকল স্থল পূর্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত । এতদ্ব্যতিরিক্ত, আবশ্যক বোধে, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ অংশে পরিবর্তিত, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা ।

২২শে পৌষ । সংবৎ ১৯৩৯ ।

## ষষ্ঠবর্তিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের তাত্রপ্রকরণে নির্দিষ্ট ছিল, “তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিস্তল হয়।” শ্রীমন্তসওদাগরপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা, বর্তমান সালের ১৫শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকাতে প্রদর্শিত করিয়াছেন, উপরি নির্দিষ্ট স্থলে, “এক ভাগ তামা” এই নির্দেশটি ভুল। “এক ভাগ তামা” ইহার পরিবর্তে, “চারি ভাগ তামা” এরূপ নির্দেশ হওয়া উচিত। তদনুসারে, ঐ স্থল সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্বিল্ল, রঙ্গপ্রকরণে, “তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়,” এতন্মাত্র নির্দিষ্ট ছিল, তামা ও রাঙের অংশ নির্দিষ্ট ছিল না। উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ন্যূনতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এই ন্যূনতারও পরিহার করা গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ভুল ও এই ন্যূনতার প্রদর্শন করাতে, আমি অতিশয় উপকৃত ও অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা।

২৫শে ভাদ্র ১২৯৩ সাল।

## পদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ ত্রিবিধ, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, উহারা চেতন পদার্থ; যেমন মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেই খানে থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।

## ঈশ্বর

ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।

## চেতন পদার্থ

সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ, মুখ দ্বারা আহারের গ্রহণ, এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণ করিয়া, প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই উহারা বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ ঘটে।

প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা, তাহারা দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আশ্বাদন, ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুতুলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না ; মুখ আছে, খাইতে পারে না ; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না ; হস্ত আছে, কোনও কৰ্ম করিতে পারে না ; কর্ণ আছে, কিছু শুনিতে পায় না ; চরণ আছে, চলিতে পারে না। ইহার কারণ এই, পুতুলিকা অচেতন পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল জন্তুদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কোনও ব্যক্তির চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুতুলিকার মুখ, চোক, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশ ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না ; উহা অচেতন পদার্থই থাকে ; দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে ; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে ; কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলে থাকে ; আর কতকগুলি স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য সর্বপ্রধান। আর সমুদয় জন্তু মনুষ্য অপেক্ষায় নিকৃষ্ট। তাহারা, কোনও ক্রমে, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরের চৰ্ম্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু বলে ; যেমন গো, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেষ, মহিষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পশুর চারি পা, এ জন্তু পশুদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে। কতকগুলি পশুর পায়ে খুর আছে ; যেমন গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, ছাগল, গর্দভ প্রভৃতির : কোনও কোনও পশুর খুর অখণ্ডিত, অর্থাৎ জোড়া ; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ; যেমন গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর পায়ে খুর নাই, নখর আছে ; যেমন বিড়াল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর লোম অনেক কাজে লাগে। মেষের লোমে কস্মল, বনাত প্রভৃতি প্রস্তুত হয় ; তিব্বৎদেশীয় ছাগলের লোমে শাল হয়।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্বত্র পালকে ঢাকা। পক্ষীর দুই পাশে দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে ; উহা দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশবোধ হয় না। পক্ষীর দুটি পা আছে ; তাহা দ্বারা চলিতে পারে, এবং বৃক্ষের

শাখায় বসিতে পারে। কোনও কোনও পক্ষী অতিশয় ক্ষুদ্র ; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। পক্ষীরা, খড়, কুটা, তৃণ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে। কাক, কোকিল, পারাবত প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর আকার কিছু বৃহৎ। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভাল বাসে ; ইহারা জলচর পক্ষী। সকল পক্ষী আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে। কিছু দিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে, ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান কহে।

মৎস্য একপ্রকার জন্তু। ইহারা জলে থাকে। মৎস্যের শরীর ছালে আচ্ছাদিত। ঐ ছালের উপর মসৃণ, চিক্ণ শব্দ অর্থাৎ অঁইস আছে। বুয়াল, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে অঁইস নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসে। মৎস্যেরা অতি বেগে সাঁতার দিতে পারে, এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া, কীট ও অন্ত অন্ত ভক্ষ্য বস্তু ধরে।

আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ কহে ; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।

সর্প প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বুকে ভর দিয়া চলে। সর্পের শরীরের চর্ম অতি মসৃণ ও চিক্ণ। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিকটিকি প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে ; ইহারা তাহা দ্বারা চলে। ভেকজাতি অতি নিরীহ। কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত, ইহাদিগকে ক্লেস দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমন নিষ্ঠুর যে, ভেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যষ্টিপ্রহার করে।

পতঙ্গজাতি একপ্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে ফড়িঙ, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। কোনও কোনও পতঙ্গ-জাতি, সময়ে সময়ে, অত্যন্ত ক্লেসকর হইয়া উঠে। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাবিধ। উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীটজাতি।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেকবিধ জন্তু আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, অনুবীক্ষণ ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে, জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে।

সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণিসমূহে পরিবৃত। অবশ্যই কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সমস্ত প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি, অনেক স্থলে, তাহার নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

জগতে কত জীব আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা ! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

অধিকাংশ জন্তু লতা, পাতা, ফল, মূল, ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু, আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের মাংস খায়। উহাদিগকে স্থাপদ অর্থাৎ শিকারি জন্তু বলে।

অশ্ব, গো, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু লোকালয়ে থাকে, এবং মানুষে যাহা দেয়, তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্য পশু বলে। গ্রাম্য পশুরা অতি শান্তস্বভাব, মানুষের অনেক উপকারে আইসে।

কোন জন্তু কোন শ্রেণীতে নিবিষ্ট, কাহার কি নাম, বিশেষ রূপে জানা অতি আবশ্যক। কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে ; যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নামে ডাকা কর্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি ফড়িঙকে পশু বলে ; কিন্তু ফড়িঙ পশু নয়, পতঙ্গ। যে সকল জন্তুর চারি পা, তাহাদিগকে চতুষ্পদ বলে। পক্ষী চতুষ্পদ নহে, কারণ উহার দুটি বই পা নাই ; এজন্য, উহাকে, চতুষ্পদ না বলিয়া, দ্বিপদ বলা উচিত।

ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে, কোন জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি ; এজন্য, কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অজ্ঞায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব, আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদমর্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। কিন্তু, উহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক ; এই নিমিত্ত, মানুষেরা উহাকে ঐ উপাধি দিয়াছে ; নচেৎ, সিংহ, অজ্ঞ অজ্ঞ পশু অপেক্ষা, কোনও মতে উৎকৃষ্ট নহে।



## মানবজাতি

মানবজাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে, সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে ; এজন্ত, সর্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর আয়, চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের দুই হাত, দুই পা। দুই হাত দিয়া, ইচ্ছামত সকল কৰ্ম করিতে পারে। দুই পা দিয়া, ইচ্ছামত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ, দুই হস্ত দ্বারা, আহারসামগ্রীর আহরণ করে, গৃহসামগ্রী ও পরিধানবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং গৃহনিৰ্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে। গৃহের মধ্যে বাস করে, এজন্ত মানুষকে রোদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। একপঙ দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ব্যক্তি, লোকালয় ছাড়িয়া, অরণ্যে বাস করে; কিন্তু তাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই, গ্রামে ও নগরে, পরস্পরের নিকট, বাটীনিৰ্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে ; যেমন কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া, বাস করে। ইহার তাৎপর্য্য এই, তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবেক, ও পরস্পর দেখা শুনা ও কথাবার্তায় সুখে কালযাপন হইবেক। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া একজাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে।

লোক মাত্রেরই জন্মভূমিঘটিত এক এক উপাধি থাকে ; ঐ উপাধি দ্বারা, তাহাদিগকে অণুদেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস ; এ নিমিত্ত, আমাদিগকে বাঙ্গালি বলে। এইরূপ, উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে ; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল ; ইংলণ্ডের নিবাসীদিগকে ইংরেজ।

জন্তু সকল, দিনের বেলায় আপন আপন কৰ্ম্ম করে, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময়, তাহারা শয়ন করে ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি

জন্তু দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। শশ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু, চক্ষু না মুদিয়া, নিদ্রা যাইতে পারে।

আমরা, নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্য্যকারক নহে। জন্তু সকল যখন নিদ্রা যায়, তখন উহাদিগকে নিদ্রিত বলে; যখন, নিদ্রা না যাইয়া, জাগিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে জাগরিত বলে।

মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। ছাগ, গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু সকল মাঠের কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেৱা, কোনও জন্তু মারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ, জিয়ন্তু কীট পতঙ্গ ধরিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না, খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। তাহারা প্রায় সকল বস্তুই, অগ্নিতে পাক করিয়া, খায়। ভাল পাক করা হইলে, ভক্ষ্য বস্তু সুস্বাদ ও শরীরের পুষ্টিকর হয়।

জন্তুগণ যখন, সচ্ছন্দ শরীরে, আহাৰ বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়। আর, যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহাৰ বিহার করিতে পারে না, সৰ্ব্বদা শুইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। মনুষ্যের পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পীড়া হইলে, চিকিৎসকেরা, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতির যে ব্যবস্থা করেন, সকলেরই, ঐ ব্যবস্থা অনুসারে, চলা উচিত ও আবশ্যক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, দ্বারায় রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায়, এবং অনেকে মরিয়া যায়।

কোনও কোনও জন্তু অধিক কাল বাঁচে, কোনও কোনও জন্তু অল্প কাল বাঁচে। হস্তী প্রায় এক শত বৎসর বাঁচে। ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর বাঁচে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোনও কোনও কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় মশা, সূর্য্যের আলোকে অল্প কাল মাত্র খেলা করিয়া, ভূতলে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মনুষ্যজাতি, প্রায় সমুদায় জন্তু অপেক্ষা, অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই। অনেকে প্রায় ষাট বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। যাহারা সন্তর, আশি, নব্বই, অথবা এক শত বৎসর বাঁচে, তাহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু অনেকেই শৈশব কালে মরিয়া যায়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে, তাহারাও, তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর আয়, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত

বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবেক না। কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবেক।

জন্তু সকল মরিলে, তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর, পূর্বের মত, দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিক্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ জন্মে; এজন্য, লোকে অবিলম্বে তাহা দন্ধ করে। কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশব কালে অতি অজ্ঞ থাকে; ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয় শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড়, ইহার আকার কেমন, শিশুরা তাহাব কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন হাত ডান, কোন হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে, ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্ন পূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর, যাহারা, বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্থ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।

## ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, আমরা কোনও বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, হৃক। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আশ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আশ্বাদন; হৃক দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পর্শ বলে।

চক্ষু

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিম্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলে, কোন বস্তুর কেমন আকার, কোন বস্তু সাদা, কোন বস্তু কাল, কিছুই জানিতে পারিতাম

না। যেখানে আলোক থাকে, সেখানে চক্ষুতে দেখা যায় ; যেখানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলোক নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। রাত্রিকালে, চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারা, অতি অল্প আলোক হয় ; এ নিমিত্ত, বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায়, সূর্যের আলোক থাকে ; এজন্য, অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে, বিলক্ষণ আলোক হয় ; তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে ; এজন্য, চক্ষুর উপর দুই খানি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার, অথবা কিছু পড়িবার, আশঙ্কা হইলে, আমরা পাতা দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি। চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতেও চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পশ্ম। পশ্ম আছে বলিয়া, চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পড়িতে পায় না, এবং সূর্যের উত্তাপ অধিক লাগে না।

যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। সে কোথাও যাইতে পারে না। যাইতে হইলে, এক জন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায় ; নতুবা সে পড়িয়া মরে। অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই, তাহাকে কাণা বলে। কাণা এক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। কাণাকে, অন্ধের মত, ক্লেশ পাইতে হয় না।

অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। উহার পশ্চাতে, পর পর, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আর তিনটি অংশ আছে। তৎপরে আর একটি অংশ আছে ; উহা কোমল পাতলা পদার্থ। স্নায়ু দ্বারা, মস্তিষ্কের সহিত, এই কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া, ঐ সকল স্বচ্ছ অংশ ভেদ করিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন, ঐ কোমল পাতলা পদার্থের উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয় ; এবং স্নায়ু দ্বারা, মস্তিষ্কের সহিত ঐ কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে বলিয়া, দর্শনজ্ঞান জন্মে।

### কর্ণ

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয় ; এ নিমিত্ত, কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। কর্ণ না থাকিলে, আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে, পটহের মত, যে অতি পাতলা এক খণ্ড চর্ম্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিম্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও কোনও

লোক এমন দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের শ্রবণশক্তি নাই ; তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কাল বলে ; কেহ কিছু কহিলে, অথবা কোনও শব্দ করিলে, কালারা শুনিতে পায় না।

#### নাসিকা

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। নাসিকা দ্বারা গন্ধের আশ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে, কি ভাল, কি মন্দ, কোনও গন্ধের আশ্রাণ পাওয়া যাইত না। নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। এই সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আশ্রাণ পাওয়া যায়। যে গন্ধের আশ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ ও সৌরভ বলে। যে গন্ধের আশ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে। চন্দন ও গোলাপের গন্ধ সুগন্ধ। কোনও বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

#### জিহ্বা

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায় ; এজন্য জিহ্বাকে রসেন্দ্রিয় বলে। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে, আমরা কোনও বস্তুর আস্বাদ বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বার অগ্রভাগে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, এই সকল স্নায়ু দ্বারা তাহার স্বাদগ্রহ হয়।

বস্তুর আস্বাদ নানাবিধ। গুড়ের আস্বাদ মিষ্ট। তেতুল অম্ল বোধ হয়। নিম ও চিরতা তিক্ত লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে ; যাহা মন্দ লাগে, তাহাকে বিষাদ বলে। কোনও কোনও বস্তুর কিছুই আস্বাদ নাই ; মুখে দিলে না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না ; যেমন গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।

#### ত্বক

ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে ; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু, সকল অঙ্গ অপেক্ষা, হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে, তাহা দ্বারা অতি উত্তম স্পর্শজ্ঞান হয়। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন, হস্ত ও অন্য অন্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া,

প্রায় সকল বস্তু জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ স্বরূপ। ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আমাদের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মে। অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাল, মন্দ, হিত, অহিত, এই সমস্ত বিবেচনা করিবার শক্তি হয়। অতএব, ইন্দ্রিয় মনুষ্যের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক।

মনুষ্যের গায়া, পশু, পক্ষী, ও অন্ত অন্ত জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু, তাহাদের কোনও কোনও ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের অপেক্ষা, অধিক প্রবল। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক। কোনও কোনও কুকুরজাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। একরূপ হইবার তাৎপর্য্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে, অন্ধকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, পলায়িত পশুর গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, তাহার অন্বেষণ করিয়া লয়। ঘ্রাণশক্তি এত অধিক না হইলে, তাহারা সহজে শিকার করিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, আঘ্রাণ দ্বারা শিকার না করিয়া, দৃষ্টি দ্বারা শিকার করে। ইহাদের দর্শনশক্তি অতিশয় প্রবল। যে পশুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, উহা অধিক দূরবর্তী হইলেও ইহারা দেখিতে পায়। যেখানে অল্প অন্ধকার, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক ভাল দেখিতে পায়। কিন্তু যেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছু মাত্র আলোক নাই, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা, অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ, যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ শক্তি আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

## বাক্যকথন—ভাষা

মনুষ্যেরা, মুখ দ্বারা শব্দের উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে, এবং উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তি দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাকশক্তি বলে।

পশু, পক্ষী, ও অন্ত্র অন্ত্র জন্তুদিগের বাকশক্তি নাই। তাহাদের মনে, কখনও কখনও, কোনও কোনও ভাবের উদয় হয় বটে ; কিন্তু উহারা, মনুষ্যের মত কথা কহিয়া, তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না ; কেবল একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে। মেষ, মহিষ, গো, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, পক্ষী, ভেক প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার শব্দ করে। ঐ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সকল অব্যক্ত শব্দ, বুঝিতে পারা যায় না ; এজন্য, ঐ সকল শব্দকে ভাষা বলে না ; শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে শিখাইলে, উহারা, মনুষ্যের মত, স্পষ্ট শব্দের উচ্চারণ করিতে পারে ; কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারে না ; যাহা শিখে, বারংবার তাহারই উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাকশক্তির অভাবে, পশু, পক্ষী, ও আর আর জন্তুদিগকে, মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জন্ম, কত বয়স, কি নাম, কাহাব কি অবস্থা, ইত্যাদি কোনও বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না ; সুতরাং, তাহারা পরস্পর শিক্ষা দিতে অক্ষম, এবং আপনাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত, কোনও উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ, মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই, চিরকাল, এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবেক ; এবং মনুষ্যেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিতে পারিবেক।

আমাদের বাকশক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে। মনে যে বিষয়ের চিন্তা করি, জিহ্বা দ্বারা তাহার উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়, কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোনও কোনও লোক এমন হতভাগ্য যে, কথা কহিতে পারে না ; উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা বলে।

সকল ব্যক্তিই অতি শৈশব কালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে শিখা সজাতীয় লোকের নিকটে হয় ; এ নিমিত্ত, প্রথমশিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।

সকলেরই স্পষ্টরূপে কথা বলিতে চেষ্টা করা উচিত ; তাহা হইলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর, যখন যাহা বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না ; সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক কি বৃদ্ধ, কি ধনবান কি দরিদ্র, কাহারও অশ্লীল ও অসামু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেরই ভাষা পৃথক পৃথক। না শিখিলে, এক দেশের লোক অন্যদেশীয় লোকের ভাষা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙ্গালা বলে। কাশী অঞ্চলের লোকে যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস্য দেশের লোকের ভাষা পারসী। আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে উর্দু বলে। উর্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন, উহা সর্ব প্রকারেই হিন্দী। ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইঙ্গরেজদিগের ভাষা ইঙ্গরেজী।

ইঙ্গরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহ পূর্বক ইঙ্গরেজী শিখে। কিন্তু, অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে।

পূর্ব কালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

## কাল

প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন আমরা শয্যা হইতে উঠি, সূর্যের উদয় হয়, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সময়কে সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবাভাগ বলে; আর, সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন আপন কর্ম্ম করে। রাত্রিকালে সকলে আরাম করে ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ন, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এই দুয়ে এক দিবস হয়; অর্থাৎ, এক প্রভাত অবধি আর এক প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাটি ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা; তিন হোরাতে, অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে,



এক প্রহর; আট প্রহরে এক দিবস; পনের দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল পক্ষ বলে। আর, যখন চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। দুই পক্ষে, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে, এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু। সমুদয়ে ছয় ঋতু; সেই ছয় ঋতু এই; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু; আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই দুই মাস বর্ষা ঋতু; ভাদ্র ও আশ্বিন, এই দুই মাস শরৎ ঋতু; কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু; পৌষ ও মাঘ, এই দুই মাস শীত ঋতু; ফাল্গুন ও চৈত্র, এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে, অর্থাৎ বার মাসে, এক বৎসর হয়।

সচবাচর সকলে বলে, ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস আটশ দিনে, কোনও মাস উনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্য বশতঃ, বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিনে হইলে, তিন শত ষাট দিনে বৎসর হইত। পূর্বকালের লোকেরা তিন শত ষাট দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অত্যাপি সামান্য লোকে তিন শত ষাট দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে, বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে, নূতন বৎসরের আরম্ভ হয়। চির কালই, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, অবলম্বন করিয়া, বৎসরের গণনা আরম্ভ হইয়া থাকে। এই রূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়, তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত, সংবৎ, শকাব্দাঃ, সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর, শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ। বিক্রমাদিত্যের উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে, ঐ শাকে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমাদের দেশে, বিষয় কর্মে, সকল শাক অপেক্ষা, সাল

অধিক প্রচলিত। এই শাকের দ্বাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ত্রয়োদশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ, ইঙ্গরেজ, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি যুরোপীয় জাতিরা, যিশু খ্রিষ্টের জন্ম অবধি, এক শাকের গণনা করেন; উহাকে খ্রিষ্টীয় শাক বলে। খ্রিষ্টীয় শাকের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

## গণন—অঙ্ক

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক। সচরাচর, সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা—এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে, অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি, এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া, উহাদের স্থলে এক এক অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

অঙ্ক সমুদয়ে দশটি মাত্র। উহাদের আকার ও নাম এই—

|    |     |     |      |      |     |     |    |     |       |
|----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|-----|-------|
| ১  | ২   | ৩   | ৪    | ৫    | ৬   | ৭   | ৮  | ৯   | ০     |
| এক | দুই | তিন | চারি | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | শূন্য |

যেমন, বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা, সকল বিষয় লিখিতে পারা যায়; সেইরূপ, কেবল এই কয়টি অক্ষরের পরস্পর যোগে, কি ছোট, কি বড়, সকল সংখ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম ০ অঙ্কে শূন্য বলে, অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। অন্য ন্যুটি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু, ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে, দশ হয়; ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে, ২০ কুড়ি হয়; ৩ এই অঙ্কের পর, ৩০ ত্রিশ; ৪ এই অঙ্কের পর, ৪০ চল্লিশ; ৫ এই অঙ্কের পর, ৫০ পঞ্চাশ ইত্যাদি। যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায়, অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায়, তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে, সহস্র বুঝায়।

১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্কে বিষম অঙ্ক বলে। আর, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্কে সম অঙ্ক বলে।

অঙ্ক দ্বারা যখন কেবল সংখ্যার বোধ হয়, তখন উহাদিগকে সংখ্যাবাচক বলে।  
সংখ্যাবাচক শব্দের নাম ও আকার নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| ১ এক          | ২৭ সাতাশ       | ৫৩ তিশ্রান্ন |
| ২ দুই         | ২৮ আটাশ        | ৫৪ চুয়ান্ন  |
| ৩ তিন         | ২৯ উনত্রিশ     | ৫৫ পঞ্চান্ন  |
| ৪ চারি        | ৩০ ত্রিশ       | ৫৬ ছাপ্পান্ন |
| ৫ পাঁচ        | ৩১ একত্রিশ     | ৫৭ সাতান্ন   |
| ৬ ছয়         | ৩২ বত্রিশ      | ৫৮ আটান্ন    |
| ৭ সাত         | ৩৩ তেত্রিশ     | ৫৯ উনষাটি    |
| ৮ আট          | ৩৪ চৌত্রিশ     | ৬০ ষাটি      |
| ৯ নয়         | ৩৫ পঁয়ত্রিশ   | ৬১ একষট্টি   |
| ১০ দশ         | ৩৬ ছত্রিশ      | ৬২ বাষট্টি   |
| ১১ এগার       | ৩৭ সাঁইত্রিশ   | ৬৩ তেষট্টি   |
| ১২ বার        | ৩৮ আটত্রিশ     | ৬৪ চৌষট্টি   |
| ১৩ তের        | ৩৯ উনচল্লিশ    | ৬৫ পঁয়ষট্টি |
| ১৪ চৌদ্দ      | ৪০ চল্লিশ      | ৬৬ ছষট্টি    |
| ১৫ পনের       | ৪১ একচল্লিশ    | ৬৭ সাতষট্টি  |
| ১৬ ষোল        | ৪২ বিয়াল্লিশ  | ৬৮ আটষট্টি   |
| ১৭ সতর        | ৪৩ তিতাল্লিশ   | ৬৯ উনসত্তর   |
| ১৮ আঠার       | ৪৪ চুয়াল্লিশ  | ৭০ সত্তর     |
| ১৯ উনিশ       | ৪৫ পঁয়তাল্লিশ | ৭১ একাত্তর   |
| ২০ কুড়ি, বিশ | ৪৬ ছচল্লিশ     | ৭২ বায়াত্তর |
| ২১ একুশ       | ৪৭ সাতচল্লিশ   | ৭৩ তিয়াত্তর |
| ২২ বাইশ       | ৪৮ আটচল্লিশ    | ৭৪ চুয়াত্তর |
| ২৩ তেইশ       | ৪৯ উনপঞ্চাশ    | ৭৫ পঁচাত্তর  |
| ২৪ চব্বিশ     | ৫০ পঞ্চাশ      | ৭৬ ছিয়াত্তর |
| ২৫ পঁচিশ      | ৫১ একান্ন      | ৭৭ সাতাত্তর  |
| ২৬ ছাব্বিশ    | ৫২ বায়ান্ন    | ৭৮ আটাত্তর   |

|            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| ৭৯ উনআশি   | ৮৮ অষ্টাশি   | ৯৭ সাতনব্বই   |
| ৮০ আশি     | ৮৯ উননব্বই   | ৯৮ আটনব্বই    |
| ৮১ একাশি   | ৯০ নব্বই     | ৯৯ নিরনব্বই   |
| ৮২ বিরাশি  | ৯১ একনব্বই   | ১০০ শত        |
| ৮৩ তিরাশি  | ৯২ বিরনব্বই  | ১০০০ সহস্র    |
| ৮৪ চুরাশি  | ৯৩ তিরনব্বই  | ১০০০০ অযুত    |
| ৮৫ পঁচাশি  | ৯৪ চুরনব্বই  | ১০০০০০ লক্ষ   |
| ৮৬ ছিয়াশি | ৯৫ পঁচনব্বই  | ১০০০০০০ নিযুত |
| ৮৭ সাতাশি  | ৯৬ ছিয়নব্বই | ১০০০০০০০ কোটি |

দশ শতে এক সহস্র, দশ সহস্রে এক অযুত, দশ অযুতে এক লক্ষ, দশ লক্ষে এক নিযুত, দশ নিযুতে এক কোটি হয়। ইহা ভিন্ন অবুদ, বৃন্দ, খর্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে, সে সকলের সচরাচর ব্যবহার নাই।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ইত্যাদি অঙ্ক যেমন এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ইত্যাদি সংখ্যার বাচক হয়, সেইরূপ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ইত্যাদি পূরণেরও বাচক হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে পূরণ বলে। যে অঙ্ক দ্বারা সেই পূরণের বোধ হয়, তাহাকে পূরণবাচক বলে। যদি দুই রেখা । । লিখা যায়, তবে শেষেরটিকে দ্বিতীয়, অর্থাৎ দুই সংখ্যার পূরণ, বলিতে হইবেক, আর আগেরটিকে প্রথম ; কারণ, শেষের রেখাটি না লিখিলে, দুই সংখ্যা পূর্ণ হয় না ; আর, আগের রেখাটি না থাকিলে, এক সংখ্যা সম্পন্ন হয় না। এইরূপ, তিন রেখা । । । লিখিলে, শেষেরটিকে তৃতীয় অর্থাৎ তিন সংখ্যার পূরণ বলিতে হইবেক ; কারণ, শেষের রেখাটি না থাকিলে, তিন সংখ্যা পূর্ণ হয় না। চারি রেখা । । । । লিখিলে, শেষেরটিকে চতুর্থ রেখা, পাঁচ রেখা । । । । । লিখিলে, শেষেরটিকে পঞ্চম রেখা বলা যায় ; কারণ, শেষের দুই রেখা না থাকিলে, চারি ও পাঁচ সংখ্যা পূর্ণ হয় না।

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্ক যখন পূরণ অর্থে লিখিত হয়, তখন ঐ ঐ অঙ্কের শেষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দের শেষ অঙ্কের যোগ করিয়া দেওয়া উচিত ; তাহা হইলে, অর্থবোধের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না ; যেমন, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ইত্যাদি। এইরূপ, অঙ্কের শেষে ম প্রভৃতি অঙ্কের যোজিত থাকিলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বুঝাইবেক। ঐ ঐ অঙ্কের যোগ না থাকিলে, এক, দুই, তিন, চারি ;

কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ; ইহার স্পষ্ট বোধ হওয়া দুর্ঘট । যদি কেহ এরূপ লিখে, “আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে এই কৰ্ম করিয়াছিলাম,” তাহা হইলে, তিন দিবসে, অথবা তৃতীয় দিবসে, ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবেক না । কেহ এরূপ বুঝিবেক, ঐ কৰ্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল ; কেহ বোধ করিবেক, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কৰ্ম করা হইয়াছিল । ফলতঃ, যে লিখিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি, ইহার নির্ণয় হওয়া কঠিন । কিন্তু, ৩ এই অঙ্কের পর যদি য এই অঙ্কের যোগ থাকে, তবে আর কোনও সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝাইবেক ।

পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা

| প্রথম    | নবম      | সপ্তদশ     | পঞ্চবিংশ   |
|----------|----------|------------|------------|
| ১ম       | ৯ম       | ১৭শ        | ২৫শ        |
| দ্বিতীয় | দশম      | অষ্টাদশ    | ষড়্‌বিংশ  |
| ২য়      | ১০ম      | ১৮শ        | ২৬শ        |
| তৃতীয়   | একাদশ    | উনবিংশ     | সপ্তবিংশ   |
| ৩য়      | ১১শ      | ১৯শ        | ২৭শ        |
| চতুর্থ   | দ্বাদশ   | বিংশ       | অষ্টাবিংশ  |
| ৪র্থ     | ১২শ      | ২০শ        | ২৮শ        |
| পঞ্চম    | ত্রয়োদশ | একবিংশ     | উনত্রিংশ   |
| ৫ম       | ১৩শ      | ২১শ        | ২৯শ        |
| ষষ্ঠ     | চতুর্দশ  | দ্বাবিংশ   | ত্রিংশ     |
| ৬ষ্ঠ     | ১৪শ      | ২২শ        | ৩০শ        |
| সপ্তম    | পঞ্চদশ   | ত্রয়োবিংশ | একত্রিংশ   |
| ৭ম       | ১৫শ      | ২৩শ        | ৩১শ        |
| অষ্টম    | ষোড়শ    | চতুর্বিংশ  | দ্বাত্রিংশ |
| ৮ম       | ১৬শ      | ২৪শ        | ৩২শ        |

ইত্যাদি ।

মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে, ১, ২, ৩, ইত্যাদি অঙ্কের পর পহিলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অঙ্কর যোগ করা আবশ্যিক । যথা,

|       |        |         |          |
|-------|--------|---------|----------|
| পহিলা | নয়ই   | সতরই    | পঁচিশে   |
| ১লা   | ৯ই     | ১৭ই     | ২৫শে     |
| দোসরা | দশই    | আঠারই   | ছাব্বিশে |
| ২রা   | ১০ই    | ১৮ই     | ২৬শে     |
| তেসরা | এগারই  | উনিশে   | সাতাশে   |
| ৩রা   | ১১ই    | ১৯শে    | ২৭শে     |
| চৌঠা  | বারই   | বিশে    | আটাশে    |
| ৪ঠা   | ১২ই    | ২০শে    | ২৮শে     |
| পাঁচই | তেরই   | একুশে   | উনত্রিশে |
| ৫ই    | ১৩ই    | ২১শে    | ২৯শে     |
| ছয়ই  | চৌদ্দই | বাইশে   | ত্রিশে   |
| ৬ই    | ১৪ই    | ২২শে    | ৩০শে     |
| সাতই  | পনরই   | তেইশে   | একত্রিশে |
| ৭ই    | ১৫ই    | ২৩শে    | ৩১শে     |
| আটই   | ষোলই   | চব্বিশে | বত্রিশে  |
| ৮ই    | ১৬ই    | ২৪শে    | ৩২শে     |

## বর্ণ

নানা বর্ণের বস্তু দেখিলে, নয়নের যেরূপ শ্রীতি জন্মে, সর্বদা এক বর্ণের বস্তু দেখিলে, সেরূপ হয় না, বরং বিরক্তিই জন্মে। এ জন্ম, জগতের যাবতীয় পদার্থ, এক বর্ণের না হইয়া, নানা বর্ণের হইয়াছে। সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম, ও অধিক ক্ষণ দেখিতে পারা যায় ; এজন্য, জগতে, অন্য অন্য বর্ণের বস্তু অপেক্ষা, হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থেই নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই ; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূল বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায়, তত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল উৎপন্ন বর্ণকে মিশ্র বর্ণ বলে। মিশ্র বর্ণের

মধ্যে, হরিত, পাটল, ধুমল, এই তিনটি প্রধান। নীল ও পীত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, হরিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। পীত ও লোহিত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, পাটল বর্ণ হয়। নীল ও লোহিত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, ধুমল বর্ণ হয়। তন্মিশ্র, কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে। সে সকলও তিন মূল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

শুক্ল ও কৃষ্ণ, সচরাচর, বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ নহে। অমুক বস্তু শুক্ল, অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে, সেই সেই বস্তুতে সর্ব বর্ণের অসম্ভাব, অর্থাৎ কোনও বর্ণ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইবেক। কার্পাস সূত্রে নিম্নিত ধৌত বস্ত্র শুল্কের উত্তম উদাহরণস্থল; রাত্রিকালীন প্রগাঢ় অন্ধকার কৃষ্ণের উত্তম দৃষ্টান্ত।

রামধনু ও ময়ূরপুচ্ছে এক কালে নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও, গগনমণ্ডলে, ধনুকের মত, নানা বর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে রামধনু বলে। রুষ্টিকালীন জলবিন্দুসমূহে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া, ঐরূপ নানা বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। রামধনুতে, তিন মূল বর্ণ ও চারি মিশ্র বর্ণ, সমুদয়ে সাত বর্ণ থাকে। ধনুকের উপরি ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধুমল, বায়লেট, এই সকল বর্ণ শোভা পায়। সূর্য্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হইয়া থাকে।

## বস্তুর আকার ও পরিমাণ

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও বস্তু বড়, কোনও কোনও বস্তু ছোট। ঘটি অপেক্ষা কলসী বড়; বিড়াল অপেক্ষা গরু বড়; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ, বলে। পুস্তকের উপরি ভাগ হইতে নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম দৈর্ঘ্য; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বিস্তার; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর, তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নহে; এ নিমিত্ত, হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে। যথা, ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্যভাগ। আটটি যব সারি সারি রাখিলে, উহাদের মধ্যভাগের যে পরিমাণ, তাহাকে অঙ্গুল বলে। এইরূপ ২৪ অঙ্গুলে, অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে, এক হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু; ২০০০ ধনুতে, অর্থাৎ ৮০০০ হাতে, ১ ক্রোশ হয়; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেই রূপে মাপা যায়। আমরা দেওয়াল, খুটি, কপাট, গাছ, ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপা যায়, গভীরতাও সেই রূপে মাপা যাইতে পারে। কোনও কোনও কপের গভীরতা ১০, ১২ হাত; কোনও কোনও পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত।

কোনও কোনও বস্তু, কোনও কোনও বস্তু অপেক্ষা, অধিক ভারী। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা, বৃহৎ পুস্তক অধিক ভারী। সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা, এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই—

- ১ টাকার যত ভার, তাহা ১ তোলা;
- ৫ তোলায় ১ ছটাক;
- ৪ ছটাকে ১ পোয়া;
- ৪ পোয়ায় ১ সের;
- ৪০ সেরে ১ মণ।

## [ ধাতু ]

আমরা সর্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। থালা, ঘটি, বাটি, গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।



অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা, ধাতুর ভার অধিক। অধিকাংশ ধাতু কঠিন, ঘা মারিলে সহসা ভাঙ্গে না। ধাতু আগুনে গলান যায়। প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া, অতি পাতলা সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও ধাতু এমন ভারসহ যে, সরু তারে ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকরে পাওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু থাকে। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়; আর যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন উহাকে বিমিশ্র বলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।

#### স্বর্ণ

গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও ব্যত্যয় হয় না; এজন্য স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু বলে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী। সর্বপ প্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; এবং ঐ পরিমাণের স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৫ মণ ৩৪ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর, মলিন হয় না; এজন্য লোকে উহাতে অলঙ্কার গড়ায়। স্বর্ণের মূল্য প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক। এ দেশে স্বর্ণে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোহর বলে। ইংলণ্ডে সচরাচর যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম সভরিন্; ইহাকেই এদেশের লোকে গিনি বলিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত নরম; এজন্য সচরাচর উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, উহার সহিত অল্প তামা ও রূপা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এইরূপ তামা ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে; কিন্তু কালিফোর্নিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও যুরাল পর্বতেই অধিক।

#### রৌপ্য

রৌপ্য, জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারী। রৌপ্য শুক্ল ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যেরূপ পাতলা পাত ও সরু তার হয়, ইহাতেও প্রায় সেইরূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমন

ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৪ মণ ১১ সের ভার বুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রৌপ্যের আকর আছে ; কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধূলি, সিকি, ছয়ানি নিষ্মিত হয়। রূপাতে নানাবিধ অলঙ্কার গড়ায়, এবং ঘটি বাটি প্রভৃতিও নিষ্মিত হইয়া থাকে।

#### পারদ

পারদ, রৌপ্যের ত্রায় শুভ্র ও উজ্জল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মত কঠিন নহে ; জলের ত্রায় তরল ; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী ; সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে ; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। তখন অগ্নি অগ্নি ধাতুর ত্রায়, ইহাতেও সুরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে ; এবং ঘা মারিলে ইহা সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না।

স্পর্শ করিলে, পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত তরল দ্রব্য অপেক্ষা শীতল বোধ হয় ; কিন্তু অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজেই উষ্ণ হইয়া উঠে। পারদকে অনায়াসেই অংসখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বৎ, সিংহল, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, বাভেরিয়া, পেরু, মেক্সিকো, এই সকল দেশে পারদের আকর আছে।

#### সীস

সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা নরম ; জল অপেক্ষা এগারগুণ ভারী। সীসের ভার, রৌপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা অল্প উত্তাপে গলে ; অত্যন্ত অধিক উত্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। জল বা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে, সীসের অধিক ] ভাবপরিবর্ত্ত হয় না, উপরের উজ্জলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকা, এই সকল দেশে অপরিয়াপ্ত সীস পাওয়া যায়। হিমালয় পর্বতে ও তিব্বৎ দেশেও, সীসের আকর আছে।

সীস কাগজের উপর টানিলে, ধূসর বর্ণ রেখা পড়ে। সীসেতে পেন্সিল প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ সীসেতে গোলা ও গুলি নিষ্মিত হইয়া থাকে। কিছু শক্ত ও উত্তম রূপে

গোলাকার করিবার নিমিত্ত, ইহাতে হরিতাল মিশ্রিত করে। রসাজন মিশ্রিত করিলে, সীসেতে ছাপিবার অক্ষর নিশ্চিত হইয়া থাকে।

#### তাম্র

এই ধাতু, জল অপেক্ষা, আট গুণ ভারী। ইহা লালবর্ণ, উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার তেমন হয় না। তাম্র, সকল ধাতু অপেক্ষা, অতি গম্ভীরশব্দজনক; লৌহ অপেক্ষা, অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৩ মণ ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া যায় না।

তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। তামার পাত করিয়া জাহাজের তলা মুড়িয়া দেয়; তাহাতে জাহাজ শীঘ্র চলে ও শঙ্খ শস্যুক প্রভৃতি জাহাজের তলভেদ করিতে পারে না। অনেকে তামাতে পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিত্তল হয়। পিত্তল দেখিতে অতি সুন্দর; অনেক প্রয়োজনে লাগে। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিত্তলে তত শীঘ্র ধরে না। পিত্তলে থালা, ঘটি, বাটি, কলসী, ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

সুইডন, সাক্সনি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু, মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আগ্রা, আজমীর প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

#### লৌহ

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক কার্যোপযোগী। এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্যের যন্ত্র সকল নিশ্চিত হয়। ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, খস্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক, ছুঁচ, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি, ইত্যাদি যে সকল বস্তু সর্বদা প্রয়োজনে লাগে, সে সমুদয় লৌহে নিশ্চিত হইয়া থাকে।

লৌহ, জল অপেক্ষা, সাত আট গুণ ভারী। ইহা, রঙ্গ ভিন্ন, আর সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু। লৌহাতে মানুষের চুলের সমান সরু তার হইতে পারে। ইহা সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক ভারসহ; এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৬ মণ ১৭ সের ভারী বস্তু ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া যায় না।

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক পাওয়া যায়, এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডন, রুশিয়া, এই কয় দেশে অধিক।

## রঙ্গ

রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙা, শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল ; জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী ; পূর্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু ; রূপা অপেক্ষা নরম ; সীস অপেক্ষা কঠিন ।

ইংলণ্ড, জার্মানি, চিলি, মেক্সিকো, বঙ্কদ্বীপ, এই কয় স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক রঙ্গ জন্মে ।

এই ধাতুতে বাস্ম, পেটারা, কোটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নিম্নিত হয় । দুই ভাগ রাঙা ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয় ।

## ক্রয়—বিক্রয়—মুদ্রা

যাহাদের যে বস্তু অধিক থাকে, তাহারা সে বস্তু আপনাদের আবশ্যক মত রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ বেচিয়া ফেলে । আর, যাহাদের যে বস্তুর অপ্রতুল থাকে, তাহারা সেই বস্তু অন্য লোকের নিকট হইতে কিনিয়া লয় । লোকে মুদ্রা দিয়া আবশ্যক বস্তু কিনিয়া থাকে । যদি মুদ্রা চলিত না হইত, তাহা হইলে, নিজের কোনও বস্তুর সহিত বিনিময় করিয়া, অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু লইতে হইত । কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত ।

কোনও বস্তু কিনিতে হইলে, যত মুদ্রা দিতে হয়, উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য বলে । বস্তুর মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না ; কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয় । যখন যে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ ও অক্রেয় বলে । আর, যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ ও সস্তা বলে ।

মুদ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড । স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, এই ত্রিবিধ ধাতুতে মুদ্রা নিম্নিত হয় । এই সকল ধাতু হুস্ত্রাপ্য ; এ নিমিত্ত, ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে । দেশের রাজা ভিন্ন আর কোনও ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই । রাজাও স্বহস্তে মুদ্রা প্রস্তুত করেন না । মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লোক নিযুক্ত করা থাকে । রাজা স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন ; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে । যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ঐ স্থানকে টাকশাল বলে । কলিকাতা রাজধানীতে একটি টাকশাল আছে ।

টাকশালের লোকেরা হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তথায় নানাবিধ কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে, তাহা ঐ কলে প্রস্তুত হয়। ঐ মুখ ও ঐ অক্ষর, হস্ত দ্বারা নিম্নিত হইলে, তত পরিস্কৃত হইত না। কোন রাজার অধিকারে, কোন বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে এই সমুদয় লিখিত থাকে। আর, ঐ মুখও রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনিম্নিত; ছুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা রৌপ্যনিম্নিত। আর, ঐরূপ সিকি, আধুলি, টাকা স্বর্ণনিম্নিতও আছে। স্বর্ণনিম্নিত টাকাকে সুবর্ণ ও মোহর বলে।

|             |           |
|-------------|-----------|
| [ ৪ পয়সায় | ১ আনা ;   |
| ৮ পয়সায়   | ১ ছুআনি ; |
| ৪ আনায়     | ১ সিকি ;  |
| ৮ আনায়     | ১ আধুলি ; |
| ১৬ আনায়    | ১ টাকা।   |

সিকি, পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা; ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দুপ্রাপ্য; এজন্য রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্বাপেক্ষা দুপ্রাপ্য; এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বে এক মোহরের মূল্য ১৬ টাকা অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল; কিন্তু এক্ষণে উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। যদি রৌপ্য ও স্বর্ণের মুদ্রা এত দুপ্রাপ্য না হইত, সকলে অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা হইলে মুদ্রার এত গৌরব হইত না। দুপ্রাপ্য হওয়াতেই উহার এত মূল্য ও এত গৌরব হইয়াছে।

## হীরক

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজীল রাজ্যে,

রুমিয়ার অন্তর্বর্তী যুরাল পর্বতে, এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্য্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে, আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত, জলের গ্ৰায় নিশ্চল। ঐরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তন্ত্রিন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক ] হয়। কিন্তু, বর্ণহীন নিশ্চল হীরা সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য। আকার, বর্ণ, নিশ্চলতা অনুসারে, মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিশ্বাস্যপন্ন হইতে হয়। পোর্তুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে; তাহার মূল্য ৫৬৪৪৮০০০ পাঁচ কোটি, চৌষটি লক্ষ, আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য ৩৫০০০০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে, এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোনও গুণ নাই; কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না। এরূপ প্রস্তরের এক খণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, এরূপ অর্থব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কারপ্রদর্শন ও মূঢ়তাপ্রকাশ মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দেপ্রেও নামক এক ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম, ও অনুসন্ধানের পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্বে, কেহ কখনও হীরা গলাইতে পারে নাই; কিন্তু তিনি, বিচার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতেও কৃতকার্য হইয়াছেন।

হীরকের গ্ৰায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিধ মহামূল্য প্রস্তর আছে। শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

## কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, এ নিমিত্ত, উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাসি বন্ধ করিলে, পূর্বের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সাসি কাচে নিম্নিত ; সূর্য্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে না।

বালুকা ও একপ্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া যায়, এবং শীতল হইলে কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কার থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে ; রঙ করিলে, অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সাসি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লঠন, ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পর জোর দিলেই, দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া, লওয়া যায় ; তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথমে কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। এক্রূপ জনশ্রুতি আছে, ফিনিশিয়া দেশীয় কতকগুলি বণিক জলপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে, ঝড় তুফানে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা, তীরে উঠিয়া, বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্রের তীরে কেলি নামে এক প্রকার চারা গাছ ছিল ; উহার কাষ্ঠে তাঁহারা আগুন জালিয়াছিলেন। বালি ও কেলির ক্ষার মিশ্রিত হইয়া অগ্নির উত্তাপে গলিয়া, কাচ হইয়াছিল। উহা দেখিয়া, ঐ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।

যে রূপে, যে দেশে, কাচের প্রথম উৎপত্তি হউক, উহা বহু কাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিসর দেশেও, তিন সহস্র বৎসর পূর্বে, কাচের ব্যবহার ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

## জল—নদী—সমুদ্র

জল অতি তরল বস্তু, শ্রোত বহিয়া যায়, এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র।

সমুদ্রের জল এত লোণা ও এমন বিষাদ যে, কেহ পান করিতে পারে না। সমুদ্রের জল সকল স্থানে সমান লোণা নহে; কোনও স্থানে অল্প লোণা, কোনও স্থানে অধিক। সমুদ্রের উপরিভাগের জল বৃষ্টি ও নদীর জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়; এজন্য, ভিতরের জল যত লোণা, উপরের জল তত নয়। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা, দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।

অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে কোনও বর্ণ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

সমুদ্র কত গভীর, এ পর্য্যন্ত, তাহার নির্ণয় হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর, সেখানেও আড়াই ক্রোশের বড় অধিক হইবেক না। অনেকে সমুদ্রের জল মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ ৩১২০ হাত, কেহ ৪৮০০ হাত, কেহ ১৮৪০০ হাত, দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও রজ্জুই তলস্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং, সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। লাপ্লাসনামক ফরাসিদেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রে যত জল আছে, যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া যায়; আর, যদি তাহার চতুর্থ ভাগ ন্যূন হয়, তাহা হইলে, সমুদ্রয় নদী, খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথানিয়মে প্রতিদিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জুয়ার ও ভাটা বলে। অর্থাৎ, সমুদ্রের জল যে সহসা স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে জুয়ার বলে; আর, ঐ



জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে, তাহাকে ভাটা বলে। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রের উপর দিয়া, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজ ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিংবা চড়ায় লাগে, তাহা হইলে বড় বিপদ; জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, কতক দূর গেলে, আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না। তাহার কারণ এই, জাহাজে কম্পাস নামে একটি যন্ত্র থাকে; ঐ যন্ত্রে একটি সূচী আছে; জাহাজ যে মুখে যাউক না কেন, সেই সূচী সর্বদা উত্তর মুখে থাকে; তাহা দেখিয়া, নাবিকেরা দিগ্‌নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, উহাকে পূর্ব দিক বলে; যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। পূর্ব দিকে ডানি হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর, ও পশ্চাতে দক্ষিণ, দিক হয়। এই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করিয়া, লোকে, কি স্থলপথে, কি জলপথে, পৃথিবীর সকল স্থানে যাতায়াত করে।

নদীর ও অন্য অন্য শ্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিষাদ ও লবণময় নহে। যাবতীয় নদীর উৎপত্তি স্থান প্রস্রবণ। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদী আছে, সকলেরই এক এক প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্বদা বৃষ্টি হয়; এজন্য, ঐ সময়ে, সকল নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সমস্ত প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রে জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল, সর্বদা, কুস্মটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্প মেঘ হয়। মেঘ সকল, যথাকালে, জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা, পুনরায়, নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।

সমুদ্র ও নদীতে নানা প্রকার মৎস্য ও জলজন্তু আছে।

## উদ্ভিদ

যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে ; যেমন তৃণ, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি। উদ্ভিদ সকল যখন বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে জীবিত বলা যায় ; আর, যখন শুকাইয়া যায়, আর বাড়ে না, তখন উহাদিগকে মৃত বলে। উদ্ভিদের জীবন আছে বটে, কিন্তু, জন্তুগণের ন্যায়, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না। উহারা, যেখানে জন্মে, সেই খানে থাকে ; এ নিমিত্ত, উহাদিগকে স্থাবর বলে।

উদ্ভিদ সকল, মূল দ্বারা, ভূমি হইতে রসের আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রস মূল হইতে স্ফন্দদেশে উঠে ; তৎপরে, ক্রমে ক্রমে, সমস্ত শাখা, প্রশাখা, ও পত্রে প্রবেশ করে। এই রূপে, ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয় ; তাহাতেই উহারা জীবিত থাকে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ যদি সূর্যের উত্তাপ না পায়, তাহা হইলে বাড়িতে পারে না। শীত কালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয় ; এজন্য, পত্র সকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, পুনর্ব্বার রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয় ; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণের অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত। অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত বলিয়া, উদ্ভিদে আঘাত লাগে না, [ এবং পুষ্টি বিষয়েও আনুকূল্য হয়। যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে শুকাইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে রোপিলে, তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ একরূপ আছে যে, উহাদের শাখা, অথবা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে রোপিয়া দিলে, নূতন উদ্ভিদ জন্মে।

উদ্ভিদ, মানুষের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি। ফল, মূল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি আমাদের আহার ; কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি জালিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করি ; তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া লই ; এবং তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকি।

জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদের আয়তন এবং আকারের বিলক্ষণ তারতম্য আছে। আফ্রিকা-দেশস্থ বাওবাব বৃক্ষের কাণ্ড একরূপ স্থূল যে, তাহার বক্ষল খুলিয়া লইয়া তাঁবু প্রস্তুত করিলে তন্মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে শয়ন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে

দেবদারু জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ, তিন শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত পর্যন্ত তাহার কোনও শাখা প্রশাখা থাকে না ; অতএব তাহার গুঁড়িই ত্রিতল গৃহের অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশেও শাল, বট প্রভৃতি নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। বটবৃক্ষ তাদৃশ উচ্চ না হইলেও, আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ ছিল ; তিন চারি সহস্র লোক তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারিত।

এক দিকে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ আছে, অপর দিকে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রক বা কৌড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে, তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ। কোনও কোনও কৌড়ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয় ; উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।

আম, কাঁটাল, জাম, আতা, পিয়ারা, বাদাম, দাড়িম ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদ ফল বৃক্ষে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে। যেখানে বহু পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাকে পুষ্পোদ্যান কহে।

কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বন্ধল একরূপ স্থূল, কোমল ও রক্তশূন্য যে তদ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নিষ্পিত হয়। আমেরিকার পেরু প্রদেশস্থ সিস্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক্ সিন্ধু করিলে যে কাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। ইদানীং দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে সিস্কোনার চাষ হইতেছে। পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট্ রজু প্রভৃতি প্রস্তুত হয় ; তিসির ছাল হইতে যে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হয়, তাহাতে লিনেন্, কেম্ব্রিক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বয়ন হইয়া থাকে।

অসুখের সময়, রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন। কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর স্থায় এক প্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কন্দ বলে ; যেমন আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।

অনেকে প্রাতঃকালে ও সায়াছে, চা খাইয়া থাকেন। ঐ চা, এক প্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ জলে রাখিয়া দিলে, প্রস্তুত হয়। চীন, জাপান, আসাম, দার্জিলিঙ্ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে, ঐ গুল্মের চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নীলের চাষ হয়। উহার গাছ জলে পচাইলে, এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ বাহির হয় ; ঐ পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই, নীলবড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোনও কোনও বৃক্ষের নির্ঘাস বা আঠা অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজ হইতে পেন্সিল বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবার ব্যবহৃত হয়, তাহা বটগাছের গুয়ায় এক-প্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র। ধূনা, টার্পিন তৈল, খদির, হিঙ্গ, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্ঘাস হইতে উৎপন্ন। পোস্ত গাছের ফল চিরিয়া দিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা হইতে অহিফেন বা আফিম প্রস্তুত হয়।

সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার মজ্জা হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

## পরিশ্রম—অধিকার

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না, ভিক্ষা করিলে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কৰ্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনিৰ্ম্মাণ ও কৃষিকৰ্ম সম্পন্ন হইত না, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না, সকল লোক দুঃখে কালযাপন করিত; পৃথিবী এক্ষণে, অপেক্ষাকৃত যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেরূপ কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও ধনবান্ হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয় পাইয়া ধনবান্ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু তাহারা পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনলাভ অল্প লোকের ঘটে; সুতরাং সেই কয়জন ভিন্ন, সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হয়।

লোকে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে। অর্থ না হইলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না করে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া

যাইবে ; সমস্ত বস্তু, ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবে এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেষ হইবে। তাহা হইলে সকল লোককে, নানা কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যতদিন কর্ম্মক্ষম না হয়, পিতা মাতা তাহাদের প্রতিপালন করেন। অতএব, যখন পিতা মাতা বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্যকর্তব্য কর্ম্ম ; না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে ; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্ব্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে ; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, এবং বড় হইয়া ধনোপার্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করে, অথবা অন্নের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহার। সে ভিন্ন অন্নের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্নে লইতে পারিবে না ; এজন্মই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্নে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্নের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত ; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্ব্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত ; আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয় ; তাহার কত অপমান ; সে সকলের ঘৃণাম্পদ হয় ; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না ; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে ; তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার ; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইতে পারে। বায়ু, সূর্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল, এ সমস্ত, ও এরূপ আর আর বস্তুতে সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে ; বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

## দুরূহ শব্দের অর্থ

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

অশ্লীল—কুৎসিত, ঘৃণাকর, লজ্জাজনক।

কপিশ—মেটিয়া।

কলাই—কোনও ধাতু গলাইয়া অথবা কোনও দাতুনির্মিত পাত্র প্রভৃতিতে মাখাইয়া দেওয়া। সাধারণতঃ  
রঙ্গ ও দস্তা গলাইয়া কলাই করা হইয়া থাকে।

ধূল—বেগুনিয়া।

ধূসর—পাঁশুটিয়া।

নীলকান্ত—নীলবর্ণের মণি।

পটহ—ঢাক।

পাটল—পাটকিলে।

পদ্মরাগ—লোহিতবর্ণের মণি।

পিঙ্গল—পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, বরণা, পর্বতের উপরিভাগ হইতে যে জল নিম্নে পতিত হয়।

মরকত—হরিতবর্ণের মণি।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে, স্পর্শ করিলে কোনও মতে উচ্চনীচ বোধ হয় না।

মস্তিষ্ক—মস্তকের ভিতর ঘূতের মত যে কোমল বস্তু থাকে; ইদানীন্তন যুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্কে মন  
ও বুদ্ধির স্থান বলেন।

মেরু—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয়। এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান; এজ্জা তথায় দ্রব দ্রব্য  
জমিয়া যায়।

লোহিত—লাল।

ভায়লেট—ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

বিনিময়—বদল।

বিনিয়োগ—প্রয়োগ, কোনও বিষয়ে নিয়োজিতকরণ।

সাল ও হিজিরা—হিজিরার ২৬৩ অব্দে সম্রাট আকবর ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রবর্তিত করেন।

হিজিরার ৭২২ চান্দ্রমাস অহুসারে পরিগণিত, ইলাহীর ৭২২ সৌরমাস অহুসারে পরিগণিত।

চান্দ্রমাস অহুসারে পরিগণিত ৭২২ দিন, ২১ দণ্ড, ৩৫ পল, আর সৌরমাস অহুসারে  
পরিগণিত ৭২২ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩২ পল হয়। ইলাহী প্রবর্তনের সময় হইতে চান্দ্রমাসের

অনুযায়ী গণনা অনুসাবে ৩৫৫ বৎসর, আর সৌরমাসের অনুসারে ৩৪৫ বৎসর হইয়াছে। স্মৃতরাং, এক্ষণে হিজিরার অঙ্ক ১৩৩১ ; ইলাহীর অঙ্ক ১৩১২। সাল ইলাহীর নামান্তর মাত্র।

স্নায়ু—সর্বশরীরে সঞ্চারিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল পদার্থের যোগ আছে।

এইজ্ঞা কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

হরিত—সবুজ।

হোরা—ইংবেজী এক ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড কাল।]

বিভাসাগর মহাশয়ের সমাজ ও সাহিত্যবিষয়ক বইগুলির তাঁহার জীবিতকালের সংস্করণ বহু কষ্টে সংগ্রহ করা গিয়াছে, কিন্তু শিক্ষাবিষয়ক সকল বইয়ের পুরাতন অর্থাৎ তাঁহার জীবিতকালের সংস্করণ বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করা যায় নাই। শিশুরা এই সকল বই পড়িবার জন্য সংগ্রহ করিয়াছে এবং পড়িতে পড়িতে ছিঁড়িয়াছে অথবা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, কোনও লাইব্রেরিই এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে নাই। ‘বোধোদয়’ একখণ্ড আমরা ছেঁড়া অবস্থায় পাইয়াছি, সব পাতা নাই। যে যে স্থান নাই, পরবর্ত্তী রিসিভারের সংস্করণ হইতে সেগুলি [ ] চিহ্নের মধ্যে মুদ্রিত হইল।